প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে অভিজিৎ সেনের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে অভিজিৎ সেনের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তার প্রাচুর্য দেখা দিতে থাকে। বিগত ষাট বছরকে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক বিস্তৃতি ও প্রতিষ্ঠার কাল বলতে পারি। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা গল্প তার বিস্তৃতির সীমাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসারিত করেছে। পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 'এক স্বৈরবৃত্ত দ্রুত ধাবমান পরিবর্তনশীল সময়।'[১] সমাজ ও সময়ের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গ বাংলা গল্পের ধারাকে নানা খাতে প্রবাহিত করেছে, রাজনীতি এই পর্বের গল্পকে অসম্ভব শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। ফলে বাংলা গল্প পৌঁছে গেছে পরিণতির উত্তুঙ্গ এক শিখরে।

সত্তর — আশির দশকের একজন শক্তিমান গল্পকার অভিজিৎ সেন। যুগ - জীবনের অভিঘাত তাঁর গল্পের অস্থি - মজ্জায় সঞ্চারিত। বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস সচেতন, রাজনীতি সচেতন এই লেখকের দেশকাল - লগ্ন আবির্ভাব ক্ষণটিকে চিনে নিতে স্বাধীনতা উত্তরকালের তিন দশকের সমাজ - ইতিহাসের নির্মাণ - ভাঙনের প্রক্রিয়াটির বিশ্লেষণ তাই আবশ্যক। কারণ এর মধ্যেই আছে শিল্পী অভিজিতের দেশ - কাল সঞ্জাত জীবনবোধের মৌল প্রেরণাগুলি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাঙালী মধ্যবিত্ত তথা ভারতীয়রা রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর, ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল। চল্লিশের ভয়াবহ সব সামাজিক রাজনৈতিক স্মৃতি পেরিয়ে বাঙালী সেদিন স্বাধীনতা সূর্যের উত্তাপে, সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছিল। চল্লিশের দশকে বাংলায় মনুষ্য সৃষ্ট ভয়াবহ মন্বন্তরের বলি হয়েছিল প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এবং আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। খিদের জ্বালা আর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হাজার হাজার বাঙালী সেদিন তাদের সম্ভ্রম আর ন্যায় নীতিবোধ হারাতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিপূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবাদে বাঙালী সমাজে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন শ্রেণী — কন্ট্রাকটর, দালাল, ফড়িয়া, মজুতদার এবং আড়তদারের দল। যার এদেরই সক্রিয়তায় বাংলার অর্থ ব্যবস্থায় গড়ে উঠল এক নতুন পরিমণ্ডল, যার নাম কালোবাজার। এর পাশাপাশি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশভাগ জনিত দগদগে ক্ষত, যার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকেই। অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রনা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব ছিন্নমূল বাস্তুহারার দল সেদিন এই বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের স্বপ্নভঙ্গ ছিল দেশভাগ, আর দুঃস্বপ্ন হল শিবির জীবন। এই বিপন্ন সময়ের জের চলল সমগ্র পঞ্চাশের দশক জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।

সমাজ - সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে নিরন্তর এই সংঘাত ও সংঘর্ষ, মূল্যবোধের ক্রমবিনাশ এই দশকের বাঙালী মধ্যবিত্তকে নাড়া দিয়ে গেল। স্বপ্নভ্রষ্ট আশাহত বাঙালী সেদিন বামপন্থী রাজনীতি বা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেও নতুন কোনো দিশা খুঁজে পেলেন না। এই বিশেষ সামাজিক -

রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটগল্পে পট-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। হতাশা-নৈরাশ্য আর বিষাদ ধ্বস্ত এই সামাজিক পটভূমিতে বাঙালী গল্পকারদের একটা অংশ চল্লিশের সমাজ বাস্তবের বাইরে গিয়ে তাদের গল্পে আত্মসন্ধান ও আত্মসমীক্ষণের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরলেন। বহির্জগতের বস্তুবাদ আর তাদের বিশেষ উজ্জীবিত করতে পারল না। 'বিষয়ের বহির্মুখতা অপেক্ষা বিষয়ীর অন্তর্মুখীতাই' এই যুগের গল্পের মর্ম লক্ষণ রূপে প্রকাশ পেল।[২]

পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য গল্পকার বিমল কর এই দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের শুরুতে 'ছোটগল্প ঃ নূতন রীতি' পত্রিকার মাধ্যমে সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে নতুন রীতি প্রবর্তনের পথ প্রদর্শন করলেন। 'ছোটগল্প ঃ নূতন রীতি' পত্রিকাটি ছিল নিতান্ত স্বল্পায়ু (৫টি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত) কিন্তু ঐ সামান্য পাঁচটি সংখ্যাই সেদিন বাংলা গল্প সাহিত্যে নিশ্চিত পালা বদল ঘটিয়ে দিল। প্রথম সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন', দ্বিতীয় সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', তৃতীয় সংখ্যায় সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস' প্রকাশিত হবার পর প্রচলিত গল্পের সংজ্ঞাই বদলে গেল।

ছোটগল্পের নতুন লক্ষণ এই আত্মপ্রকাশ পর্বে দেখা দিল — প্রচলিত জীবনযাত্রা ও সংস্কার সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, গল্পের প্রচলিত সংজ্ঞায় অতৃপ্তি, নিয়তির রহস্য সন্ধানে ব্যাকুলতা, এক অনিবার্য বিষাদ, অমোঘ মৃত্যু চেতনা জাত অস্থিরতা, ঈশ্বরের বিকল্প সন্ধান, নিঃসঙ্গ অন্তর জীবনের বেদনা ও অসহায়তাবোধ, — যা পরিবেশিত হয়েছে সংকেতময় পরিবেশে এক কাব্যময় স্নিগ্ধতায়।

বিমল কর ছাড়া এই নতুন রীতির গল্প লেখার দলে সেদিন যাঁরা সামিল হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন — অজয় দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ, সত্যেন্দ্র আচার্য, আনন্দ বাগচী প্রমুখ। তবে একথা উল্লেখ্য যে, এই নতুন রীতির গল্প লেখকরা সকলেই কোনো বিশেষ একটি রীতির গল্প লেখেন নি, শুধু নিজ নিজ সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী ছোটগল্পের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরূপের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন মাত্র, তরুণ গল্পকারদের অন্যতম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'নতুন রীতি'র গল্পের কৈফিয়ৎরূপে বলেছেন—

> ধারা বদলের কিংবা নতুন একটি রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্মআবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকরা কিংবা বিমল কর কেউই চাননি বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চনা করতে। বিদ্রোহ তাঁদের কারোরই অভিপ্রেত ছিল না বোধ হয়, তবু তাঁরা পুরনো রীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন — বহির্মুখীনতার চেয়ে তাঁদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর, তাই তাদের লেখায় স্বকৃত আত্মপ্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক কিংবা

> বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরে অতি জটিলসূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রহিত হয় -- স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে।[৩]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন —

> বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে প্রত্যাবর্তনের এই প্রয়াস ছোটগল্পকে করে তুলেছে অন্তর্মুখীন, মননপ্রধান, নিছক গল্প উপাদান সম্পর্কে উদাসীন, অন্তর - উন্মোচনে ব্যাকুল। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের বাংলা গল্পের আলোচনায় এই পটভূমি মনে রাখতে হবে।[৪]

অবশ্য এই নতুন রীতিও এক সময় পুরনো হল এবং ইচ্ছে করলে যে একেবারে নিটোল পাঠক প্রিয় গল্পও লিখতে পারেন এই রকম ভাবনা থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায় এবং দিব্যেন্দু পালিতের মতো অনেকেই সেদিন 'নূতন রীতি'র জটিল পথ থেকে পুরনো চেনা পথে ফিরতে লাগলেন।

পঞ্চাশের দশকের অন্তর্মুখী পরীক্ষা সর্বস্ব, ভাষা ও শৈলীর কারুশিল্পের প্রতি অতি মনোযোগী গল্পের ধারা ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপরিবর্তিতই ছিল। সত্তরের দশকের বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে গল্পের ধারায় আবার পরিবর্তন আসে।

> সত্তর দশক স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে গতিময় ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দশক। রুদ্ধশ্বাস নাটকে ভরা, বৈচিত্র্যময় ঘটনায় সমৃদ্ধ এই দশকের রাজনীতি যেমন একদিকে সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও সংগঠনকে প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে, পরীক্ষিত করেছে এবং স্বরূপ উন্মোচন করেছে -- অপর দিকে এ দেশের রাজনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ, শ্রেণী সম্পর্ক, রীতি - সম্পর্ক, শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতি সহ সমস্ত উপরিকাঠামোয় এক গভীর পরিবর্তন সূচিত করেছে, আর্থ -সামাজিক ভিতে কাঁপন সৃষ্টি করেছে। সত্তর দশকের রাজনীতি এক সমুদ্র মন্থন যা সমস্ত হিসেব ওলট - পালট করে দিয়েছে, স্থিতাবস্থা ভেঙে দিয়েছে; সত্তর দশকের সূচনায় ভারতবর্ষের আকাশে - বাতাসে ধ্বনিত হল -- মুক্তির আহ্বান। একদিকে উঠেছিল 'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত' করার উদাত্ত আহ্বান, আরেক দিকে বেজেছিল এশিয়ার মুক্তি সূর্যের মার্চ সংগীত।[৫]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক দশকের মধ্যেই বাঙালী মধ্যবিত্তের যে মোহভঙ্গ ঘটেছিল, তা আরো সুতীব্র ও ব্যাপ্ত হয়েছিল ষাট - সত্তরের দশকে এসে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যে ঘাটতি, ভূমি সংস্কারের দুর্বলতা এবং সর্বোপরি ১৯৬২ তে চীন - ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সমস্ত মিলিয়ে ষাটের দশকের প্রথম কয়েক বছর এক নিতান্তই অস্থিরতার কাল। চীন - ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতের পিছু হটা দেশবাসীর মনে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে ১৯৬৪ তে এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভাজন ঘটে। এদিকে ১৯৬৪ তে প্রাধানমন্ত্রী নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস সর্বসম্মত ভাবে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত করল। ১৯৬৬ -র ১২ই জানুয়ারী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের জোর দাবিদার হয়ে

ওঠেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড সম্পূর্ণ দলীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আশায় ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। ১৯৬৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব হাতে পেয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে উপেক্ষা করে শ্রীমতী গান্ধী যে পদ্ধতিতে কংগ্রেসের তরুণ তুর্কিদের সহায়তায় নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাতে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ভারতীয় রাজনীতিতে আদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধের দিন অবসিত; ক্ষমতা দখলই একমাত্র লক্ষ্য। '৬৭-র চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হল—পাঁচটি রাজ্যে তারা ক্ষমতা হারাল, পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলো। কিন্তু কেন্দ্রে কংগ্রেস কোনক্রমে ক্ষমতা ধরে রাখল এবং শ্রীমতী গান্ধী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন।

সত্তর - আশির দশক কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের পক্ষে নয়, এই অস্থির, দ্রুত পরিবর্তনশীল সময় বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ - ৬৭ সাল থেকে ১৯৮৬ - ৮৭ সাল পর্যন্ত প্রসারিত এই খন্ডকালের রাজনৈতিক চালচিত্র বাংলা সমাজ - সাহিত্যকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। এই স্বৈরবৃত্ত কালের প্রধান ঘটনা সমূহ হল—

১৯৬৬- ৬৭ :

(১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসে ভাঙন ধরে; রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মুখার্জীর সঙ্গে অতুল্য ঘোষ ও অন্যান্যদের বিরোধের জেরে ১৯৬৬ তে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠিত হয়।

(২) ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ১২৭ টি এবং কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি পায় ১৪৩ টি আসন। অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী এবং জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৬৭- ৭০ :

(৩) নকশাল বাড়ীতে কৃষকদের উপর গুলি চালনা (২২শে মে, ১৯৬৭) কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী, সুশীতল রায়চৌধুরী, প্রমুখের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়। নকশাল আন্দোলনে শ্রেণী প্রতিনিধি রূপে ব্যক্তি হত্যার নীতি গৃহীত হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হতে থাকে। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার উদাহরণ স্বরূপ এই আন্দোলনের কর্মীরা বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙাকেও তাদের কাজ হিসাবে বেছে নিল।

(৪) ১৯৬৭ তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ভাঙন ধরল। অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস সহ আরো কয়েকজন সদস্য যুক্তফ্রন্ট থেকে সরে এলেন। ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে রাজ্যপাল কর্তৃক বরখাস্ত হল (২১শে নভেম্বর, ১৯৬৭)।

(৫) গঠিত হল নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু ২৯শে নভেম্বর ১৯৬৭ স্পিকার বিজয়কুমার ব্যানার্জী ঐতিহাসিক রুলিং দেন, প্রফুল্ল ঘোষের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

(পি ডি এফ) বেআইনি। সরকার গঠনের নামে দলবদলের ষড়যন্ত্রের শেষে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল। রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়কাল জুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা - কর্মীদের উপর অমানুষিক দমন - পীড়ন চলতে লাগল।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হল ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯। যুক্তফ্রন্টের দলগুলি যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। ২৮০ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেল ২১৮ টি এবং কংগ্রেস ৫৫ টি। গঠিত হল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখার্জী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। নানা কারণে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়তে থাকে এবং এরই পরিণতিতে ১৬ই মার্চ ১৯৭০ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলেন।

(৭) ১৯ শে মার্চ ১৯৭০ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল। যদিও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হল না।

১৯৭১ - ৭২ ঃ

(৮) মধ্যবর্তী নির্বাচনে (১০ই মার্চ ১৯৭১) যুক্তফ্রন্টের দলগুলি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। সমঝোতার ভিত্তিতে ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন সরকার শপথ গ্রহণ করল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিধায়কের দল বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন নব কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার। তিন মাস পূর্ণ হবার আগেই এই মন্ত্রীসভার পতন ঘটল।

(৯) সারা ভারতে কংগ্রেস আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস নামে দুই ভাগে বিভক্ত হল। ১৯৭১ এ লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এলো এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন।

(১০) ১৯৭১ এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নতুন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী হলেন।

(১১) ১১ই মার্চ ১৯৭২ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম বিধানসভা নির্বাচন। ২৭০ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল ২১৬ টি। সি. পি. আই (এম) সহ বিরোধীরা নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলে বিধানসভা বয়কট করলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

(১২) নতুন রাজ্য মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুর গঠিত হল।

১৯৭৩ - ৭৫ ঃ

(১৩) পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সন্ত্রাস অব্যাহত। কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত আন্দোলনকেই দমন - পীড়নের স্বীকার হতে হয়। সারা ভারতেই গণতন্ত্রের উপর আঘাত নেমে আসে। সারা ভারতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ১৯৭৫-র জুন মাসে (২৫ - ২৬ জুন মধ্যরাত থেকে) জরুরী অবস্থা জারি করল।

(১৪) প্রেস সেন্সরশিপের নামে সমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল। 'মিসা' আইন জারি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হল।

প্রথম অধ্যায়

১৯৭৬ - ৭৭ঃ

(১৫) উনিশ মাসের জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে '৭৭ - র মার্চে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেন। নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটল, মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা সরকার শপথ গ্রহণ করল।

(১৬) ১৬ই মার্চ, ১৯৭৭ লোকসভার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভারও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হল। মুখ্যমন্ত্রী রূপে জ্যোতি বসু শপথ গ্রহণ করেন। বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার লক্ষ্যে অপারেশন বর্গা কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

১৯৭৮ - ৭৯ ঃ

(১৭) পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮-এ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়।

(১৮) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে পদত্যাগ করেন।

(১৯) চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন ([illegible])। কিন্তু [illegible] দিন বাদে এই মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করে। রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি লোকসভা ভেঙে দেন।

১৯৮০ - ৮৬ ঃ

(২০) ১৯৮০ সালে সপ্তম লোকসভা নির্বাচন হয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পুনরায় মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে।

(২১) পঃ বঙ্গে '৮২-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট আরো বেশি ভোটে জয়ী হয়। [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চেহারা নেয়।

(২২) ৩১ শে অক্টোবর ১৯৮৪ ইন্দিরা গান্ধী নিজ বাসভবনে নিহত হন। দেশে দাঙ্গা গোলযোগ দেখা দেয়। রাজীব গান্ধী পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন।

(২৩) দার্জিলিং - এ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হল।

এছাড়াও এই সময়কালের অপরাপর উল্লেখযোগ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা হল — শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং সেই সুবাদে সমাজতন্ত্রের অগ্রণী যোদ্ধা হিসাবে জনমানসে নিজেকে তুলে ধরা, বামপন্থী তথা কমিউনিষ্টদের ইন্দিরা ঢেউর কাছে আত্মসমর্পণ। দেশীয় ক্ষেত্রে CPI কে মিত্র হিসাবে পাবার ফলে শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিবাদী ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সুবিধা হয় এবং '৭১ - র মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করে লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। এই বছরেরই আগষ্টে শ্রীমতী গান্ধী প্রিভিপার্সের (Privy - Purse) অবসান ঘটিয়ে রাজন্যদের সমস্ত অধিকার, দায় ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৭১ - এ ভারত - রুশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ, ১৯৭৩ - এ আরব ইস্রায়েল যুদ্ধ, তৈলসংকট,

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, আর '৭৪ - এ দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, গুজরাট ও বিহারে ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। এক কথায় ভারতবর্ষ চল্লিশের পর এত ঘটনাবহুল সময় আর প্রত্যক্ষ করেনি।

কমিউনিষ্ট ও সোসালিষ্টদের নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে ছাত্র - যুব সমাজের দ্রুত মোহভঙ্গ হতে থাকে। নির্বাচনে ছাত্র - সমাজ বামশক্তির হয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু সরকারে এসেই যুক্তফ্রন্ট সরকার এমন কিছু কাজ করতে শুরু করে যাতে গরিব কৃষক ও মধ্যকৃষকের স্বার্থ চরম ভাবে বিঘ্নিত হয়। জোতদার গোষ্ঠীর উপর থেকে লেভির আদেশ তুলে নেওয়া হয়। খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সরকার নামমাত্র দামে কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য কিনে নেয়। বাজারে খাদ্যপণ্যের যোগানে ঘাটতি পড়ে এবং কালোবাজারী শুরু হয়।

> ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে ১২০০০ লোক কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছিল। ২৬৯ টি কলকারখানায় লক আউট ঘোষিত হয়েছিল। ২৪ পরগণা জেলাতেই সর্বসাকুল্যে ৩৮ টি কারখানা ধর্মঘট কিংবা লক আউটের খপ্পরে পড়েছিল, কিংবা গুটিয়ে ফেলা হয়েছিল।[৭]

শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য কারখানা মালিক ও কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করলে হাইকোর্টের রায় অনুসারে সরকার ঘেরাও বন্ধ করে দেয়। মালিক লক আউট না তুললেও শ্রমিকদের আন্দোলন বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য সরকার মিলিটারি ডাকার আয়োজন করে।

> শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য পি. ডি. আইন প্রয়োগ। কেন্দ্র থেকে সি. আর. পি নিয়ে আসা, নকশালের শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো, ফিলিপসের কারখানায় সৈন্য পাঠিয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙা — যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছুই করতে বাকি রাখল না। পরবর্তীতে খাদ্য আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালো। পুলিশ আর সি. আর. পি মজুত করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্দী শিবিরে পরিণত করা হল।[৮]

ষাট এবং সত্তরের দশকের উত্তাল প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা নকশালবাড়ী আন্দোলন। ১৯৬২ তে ভারত - চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই কমিউনিষ্ট পার্টিতে মত বিরোধ শুরু হয়েছিল। এই মত পার্থক্য আরো তীব্র আকার নিল সাতষট্টির যুক্তফ্রন্ট সরকারের কারণে।

> সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে সি. পি. এমের বামপন্থী অংশ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিলেন। অবশ্য অনেক কর্মীই ধরে নিয়েছিলেন যে পার্টির এই সরকারে অংশগ্রহণ কার্যত সংসদীয় গণতন্ত্রের কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সত্যিকার চরিত্র উদ্ঘাটনের জন্যেই এবং যে কোন দিনই আবার তারা সরকার থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করে দেবে যে জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কখনোই আসতে পারে না। কিন্তু জঙ্গী পার্টি কর্মীদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তদুপরি পার্টির

নেতারা ও মন্ত্রীরা, জোতদাররা বেআইনীভাবে দখল করা জমি যাতে ভোগ করতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কার্যত পূরণেও সমর্থ হলেন না। ফলে পার্টির জঙ্গী কর্মীরা অধিকতর বিক্ষুব্ধ হতে থাকল।"

এই ক্রমবর্ধমান বিভেদই সংঘাতের রূপ নিল নকশাল বাড়ীতে কৃষক হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তরবাংলার তরাই অঞ্চলের এক অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ীতে কৃষক - ভূস্বামী সংঘর্ষ বাঁধে। '৬৭ সালের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পুলিশের কাছে প্রায় ১০০ টি সংঘর্ষের খবর আসে। তীর, ধনুক সম্বল করে নকশালবাড়ীর সাঁওতাল কৃষক সম্প্রদায় 'কুলাক' বা ভূস্বামীদের জমি দখল করে নেয়। মজুতদার আড়তদারদের গুদামে মজুতজাত খাদ্যদ্রব্য লুঠ করে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২২শে মে নকশালবাড়ীতে পুলিশ আঠারো জন কৃষক, মহিলা ও শিশুকে গুলি করে, বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অপরদিকে কৃষকদের তীরে মারা পড়ে পুলিশ অফিসার সোনাম ওয়াংদি।

"ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের মতো কৃষক - ছাত্র - যুব আন্দোলন সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত হয়। শুধুমাত্র কয়েকটি রাজ্য ও গোয়া, পন্ডিচেরি এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। শ্রেণীশত্রুদের বিনাশই ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই আন্দোলনকে 'শ্রেণীসংগ্রামের উন্নততর রূপ' এবং 'গেরিলা যুদ্ধের সূচনা' হিসাবে দেখা হয়েছিল। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করে নকশাল নেতা চারু মজুমদারের মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি অংশ আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে, আর যে কোনো মুহূর্তে তা থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। যেখানে সম্ভব, সেখানেই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম, পশ্চিমবঙ্গের ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর, বিহারের মুশাহারি ও পালিয়া এবং উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর জেলায় বিশেষত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

নকশালবাড়ীতে পুলিশি নিপীড়নের ঘটনায় ছাত্রদের সব প্রত্যাশা তছনছ হয়ে গেলেও নকশালবাড়ীর কৃষক বিদ্রোহ ছাত্রদের সমানে নতুন বার্তা বয়ে আনে। চিন্তা - চেতনায় ও সাংগঠনিক ভাবে ছাত্ররা আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। নকশালবাড়ীর ঘটনার পর ছাত্রদের একটা বড় অংশ ছাত্র ফেডারেশনের বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে জনমত গঠনে নেমে পড়ল। এই আন্দোলনের সমর্থনে কোলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানগুলিতে ছাত্র ফেডারেশনের বিপ্লবীরা পোষ্টার লাগায়। দফার দফায় এইসব বিপ্লবী ছাত্র নেতাকে ছাত্র ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করা হল। দিলীপ পাইন, বীরেশ ভট্টাচার্য, নির্মল ব্রহ্মচারী, আজিজুল হক, প্রলয়েশ মিশ্র, অসিত সিনহা, দীপক বিশ্বাস, অশোক ঘোষ, সুভাষ বোস, অশোক দাশগুপ্ত, শুভ্রাংশু ঘোষ এবং আরো অনেক বিপ্লবী ছাত্রনেতাকে ছাত্র ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করা হল। বহিষ্কৃত ছাত্র নেতারা তাদের মুখপত্র 'ছাত্র ফৌজ'কে ঘিরে পাল্টা ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তুলল। কোলকাতা ও জেলার ছাত্ররা এই বহিষ্কৃতদের পাশে সামিল হল। "ফলে ছাত্র আন্দোলনে এমন এক অভূতপূর্ব, জঙ্গি জোয়ার এলো, যা পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনে আগে দেখা যায় নি। ছাত্র আন্দোলনের মূল উপাদান মানবতা ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে ছাপিয়ে এই জোয়ার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়েছিল।"[১০]

প্রথম অধ্যায়

এই আন্দোলন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির স্বীকৃতি লাভ করায় ছাত্র-যুব ও তরুণরা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। শাসক দলগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ছাত্রদের যেমন হতাশ করেছিল, তেমনি নকশালবাড়ীর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় দুটি কমিউনিষ্ট দল সমেত অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির নিন্দনীয় ভূমিকাও ছাত্রদের ক্ষুব্ধ করেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিল সি. পি. আই এবং সি. পি. আই (এম)। অনেক প্রত্যাশা আর আবেগ নিয়ে এ রাজ্যের ছাত্ররা বামপন্থী কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু নকশালবাড়ীর ঘটনার পর এক উত্তাল যুদ্ধের আবির্ভাব আসন্ন বুঝে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব নিয়মতান্ত্রিক, আপোসমুখী হয়ে গেলেন। বিপ্লবকে এড়িয়ে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রই যে একমাত্র পথ, এ তত্ত্বই তারা পরোক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ১৯৬৭-র নকশালবাড়ীর ঘটনার পর ছাত্ররা দেখল, আদর্শবাদ আর আমলাতন্ত্র একাকার হয়ে গেলে কি নিদারুণ শূন্যতা নেমে আসে।

নকশাল নেতা চারু মজুমদার সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দিলেন। 'যদি বিপ্লব ঘটাতে হয় তাহলে একটি বিপ্লবী দল থাকা প্রয়োজন'- মাও-র এই আপ্তবাক্যকে স্মরণ করে ১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল আন্দোলনকারীরা গড়ে তোলে 'কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিষ্ট)।'[১] আন্দোলনকারীরা ঘোষণা করে যে, গেরিলা যুদ্ধের জন্য গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের জাগ্রত করা, কৃষি ভিত্তিক বিপ্লবকে উন্মোচন করা, গ্রামীণ ভিত্তি গড়ে তোলা, শহরগুলিকে বিচ্ছিন্ন গ্রামের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করা এবং সবশেষে শহরগুলি দখল করে সমগ্র দেশকে মুক্ত করাই তাদের দলের প্রথম ও প্রধান কাজ।

> চারু মজুমদার বললেন, লেখাপড়া ছেড়ে যাও বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো, যে যতো বই পড়ে সে ততো মূর্খ হয়, খতম মানে খুন নয়, শ্রেণী ঘৃণার চরম প্রকাশ, এটা আত্মরক্ষার যুগ নয়, আত্মত্যাগের যুগ, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ, চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করো।[২]

এই কর্মসূচীর ফলে এক বেসামাল বৈপ্লবিক-পরিমণ্ডল তৈরী হল। তপ্ত, উত্তেজিত পরিবেশে শত্রু-মিত্র বিচারের অবকাশ থাকল না। শ্রেণীশত্রু নির্ণয়ে সরলীকৃত নানা তত্ত্ব হাজির হল। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত শত্রুতাও এর সঙ্গে মিশে শ্রেণীশত্রুর তত্ত্বকে বিকৃত করে তুলল এবং এ লড়াই এক গৃহযুদ্ধের রূপ নিল। ভয়ঙ্কর আত্মকলহের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত, অসহায়, অভুক্ত তরুণরা মারার এবং মরার অধিকার লাভ করল। শুরু হল নকশালপন্থীদের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার অভিযান। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংগঠন গড়া হতে লাগল। সর্বত্র শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করে খতম তালিকা তৈরী এবং খতম অভিযান শুরু হল। কোলকাতার পথে পথে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি ভাঙার রাজনীতি শুরু হল।

> "সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়। গলির মোড়ে আঁধার ঘনিয়ে এলেই পথঘাট শুনশান; গৃহস্থ জানালাগুলো আধবোজা, তার আড়ালে ত্রস্ত ফিসফাস। আর এসবের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কালো পুলিশগাড়ির আচমকা আনাগোনা, আলকাতরা ছোপানো টাটকা দেয়াল লিখনের আশেপাশে সন্দেহজনক স্তব্ধতা। প্রতিবেশী ছাদ তাক করে চমকে

ওঠা টর্চের আলো, অনেকগুলি পায়ের এলোমেলো দুদ্দাড় ছুট। দূরে কোথাও গুলি বা বোমার শব্দ, আর্তনাদ ...। এই নৈশ কোলাজ শেষ হয়ে গেলে পরদিন সাধারণত সত্য - মিথ্যা - অর্ধসত্যে ঠাসা নানা খবর, খুনের পাইকারী হিসেব পাওয়া যেত, যেন আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান — এমনই নিস্পৃহতায়। এই চলেছিল তখন, দিনের পর দিন। তথাকথিত মুক্তির দশক এসেছিল গণহত্যা - গুপ্তহত্যা - বোমা - পাইপগান - মিসা - খার্ডডিগ্রি - পাড়া ছাড়া হবার ঘটনা ও দুর্ঘটনা সঙ্গে নিয়ে। একদিকে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে নিবেদিত যৌবন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার সংকল্প। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস - এমনই বীরোচিত ভ্রান্তি; অন্যদিকে অন্তর্ঘাত, অতিরেক, আদর্শচ্যুতি, অতর্কিত নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্নতম প্রকাশ। সব মিলিয়ে স্বদেশ সময়ের মনিবন্ধে অভূতপূর্ব উত্তেজনা —স্ফিগমোম্যানোমিটারের কাঁটা ঊর্ধ্বমুখী।[১৩]

নকশালবাড়ী আন্দোলন সবচেয়ে সংকটগ্রস্ত করল ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন অবস্থায় সবচেয়ে বাম অবস্থানকারী পার্টি সি. পি. আই (এম) কে, যে ছিল পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বের অবস্থানে।

সংসদ সর্বস্ব, সরকার রক্ষার রাজনীতিতে আচ্ছন্ন সি. পি. আই (এম) এই কৃষক বিদ্রোহকে যথার্থ মূল্যায়ন মারফৎ নেতৃত্বদানের পরিবর্তে সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের ওপর গুলি বর্ষণ ও হত্যার পথকেই বেছে নিল। এই পার্টির মধ্যকার জঙ্গি, আদর্শবাদী অংশ নকশালবাড়ীর কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে পার্টির সংস্কারবাদী সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। গড়ে উঠল নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি যা পরবর্তীকালে রূপ পেল কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো - অর্ডিনেশন কমিটি হিসাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সম্ভাবনা জাগিয়ে এই নেতৃত্ব গড়ে উঠল, তাকে রূপ দিতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। ভারতবর্ষের অর্থ - সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় চরিত্র, শ্রেণী সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক অবস্থা ইত্যাদির বাস্তব ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে না পারলেন উপযুক্ত রাজনীতি ও রণকৌশল রচনা করতে, না পারলেন এদেশে দীর্ঘদিন ধরে বসে থাকা সংস্কারবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে কষ্টসাধ্য ধৈর্যশীল সংগ্রাম গড়ে তুলতে। ভারতবর্ষের বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি শ্রমিকশ্রেণীকে উপেক্ষা করে নির্ভর করলেন কৃষক ও ছাত্র - যুব সম্প্রদায়ের ওপর, উল্টোদিকে তৎকালীন সংকটজাত অস্থির যুবক ও কৃষকের দল জমায়েত হল এই নেতৃত্বের পতাকা তলে। বিদ্রোহের সাহস ও লড়বার মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হল না বিজ্ঞতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। তাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঠিক অবস্থান থেকে শুরু করে তাঁরা পৌঁছলেন অতি - বাম মেরুতে, ব্যর্থ হলেন ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অতি প্রয়োজনীয় বিপ্লবী ধারাকে বিকশিত করতে। তত্ত্বগত সংগ্রাম এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারকে অবহেলা তো করলেনই, উপরন্তু বিপ্লবের শর্টকাট রাস্তা গ্রহণের তাগিদে একে একে গ্রহণ করলেন পার্লামেন্ট ও গণআন্দোলন, গণসংগঠন বর্জনের লাইন — গ্রহণ করলেন ব্যক্তি হত্যার সর্বনেশে রাজনীতি। এই স্বতঃস্ফূর্ত অধঃপতন থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করতে পারল না। কো - অর্ডিনেশনের কোনো প্রভাবশালী সঠিক নেতৃত্ব না গড়ে ওঠার ফলে অনেক সম্ভাবনা জাগিয়েও তা পেটিবুর্জোয়া বিদ্রোহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না।[১৪]

প্রথম অধ্যায়

নকশালপন্থীদের এই অতি-বাম কার্যকলাপ বামপন্থী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বিপ্লবী আন্দোলনকে পিছু হটিয়েছে, আর শেষ বিচারে প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে। এদেশের কমিউনিষ্ট নামধারী সুবিধাবাদী আপোসকামীরা এই অবস্থার সুযোগ ষোল আনা আদায় করেছে।

১৯৬৭ - ৭২ -এই পাঁচ বছর নকশালবাড়ী আন্দোলনের মধ্যে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশি। ঐ সময় প্রায় চার হাজার সংঘর্ষের ঘটনার খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাড়ে তিন হাজার ঘটনা ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। শুরু থেকেই এই আন্দোলনকে দমনের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলিও নকশালপন্থীদের নিধনে নেমে পড়ে। সবচেয়ে বেশি প্ররোচনা এসেছিল মার্কসবাদী পার্টির কাছ থেকে। ময়দানের জনসভায় C.P.I (M) -র নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন, "নকশালপন্থীদের পুলিশ আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা ২৪ ঘন্টায় তাদের ঠান্ডা করে দেব।"[১৫] প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য, নকশালপন্থী ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্যে অনুগত ছাত্রদের হাতে রাইফেল তুলে দিতে চেয়েছিলেন।[১৬] এইভাবে লাল লাইনবোর্ডের আড়ালে নকশালপন্থী বিপ্লবী চারু - সুকান্তের ওপর নেমে এল প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী আক্রমণ। আন্দোলন দমনে ১৯৭১ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন স্টিপল চেজ'। কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই চারু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে এবং ২৮শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। চারু মজুমদারের মৃত্যুতে নকশাল আন্দোলনের প্রথমপর্বের সমাপ্তি ঘটে।

যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে নকশালবাড়ী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত কিন্তু প্রাপ্তির পরিণতি পেল না। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানানো হলেও ব্যক্তি হত্যার পন্থা, কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের শেকড় প্রসারিত না করা এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা হারাল। আবার মূলত শহরকেন্দ্রিক সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষেও সহজেই এই আন্দোলনকে দমন করা সম্ভবপর হল। ১৯৭২ সালের মধ্যেই এই আন্দোলন অনেকাংশে থিতিয়ে এল। পুলিশ, মিলিটারি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নে প্রাণ হারাল অগণিত প্রতিশ্রুতিময় যুবক। বস্তুত হত্যা এবং প্রতিহত্যা, অগণতান্ত্রিক দমন নীতি প্রভৃতি কারণগুলি মিলেমিশে অপমৃত্যু ঘটল এক রাজনৈতিক আদর্শবাদের।

নকশালবাড়ী আন্দোলন মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ, বদ্ধ জীবনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

> ঔপনিবেশিক আমল থেকে সুযোগ - সুবিধা ভোগী মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেটা এক বিপুল নাড়া বৈকি ! তেভাগা - তেলেঙ্গানার পর এত বড় ধাক্কা কখনো আসেনি ভারতের রাজনীতিতে, সত্তর দশক নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পার্লামেন্টারী মার্কসীয় রাজনীতি, ধাক্কা মেরেছিল সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক রূপরেখার ধ্বসে পড়া প্রাচীরে। জাগিয়ে তুলেছিল দিন বদলের প্রত্যাশা।[১৭]

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার যে পরিকল্পনা নকশালপন্থীরা গ্রহণ করেছিলেন তারই ফলে ঐ সময় শহরের বহু উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবক - যুবতীরা সরাসরি গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গ্রামের মানুষের মধ্যে চেতনাবোধ আনতে এবং পার্টি সংগঠন গড়ার কাজে এরা অনেকেই সুখসজ্জা ও ব্যক্তিগত জীবনের ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করে সাধারণ গ্রামজীবনের শরিক হতে শুরু করেন। ফলে সত্তরের দশকের সাহিত্যে গ্রামের মাটি ও মানুষ নতুন ভাবে রূপ পেতে থাকে। শ্রমিক - কৃষক সর্বহারাদের সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে সত্তরের দশকের গল্পে বাস্তবতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে থাকে। গল্পে শ্রেণী চেতনার দিক পরিবর্তিত হয়।

সত্তরের দশকের প্রবাদ প্রতিম সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্যের[১] অনুসরণে ধরা যেতে পারে সমাজ - সাহিত্যে এই স্বৈরবৃত্ত সময়ের অভিঘাত জাত ফল —

১) সত্তরের আন্দোলন গ্রাম ও শহরের এ - তাবৎ বিচ্ছিন্নতা, দুই দ্বীপে দুয়ের অবস্থান প্রচন্ড অভিঘাতে ভেঙে দেয়। গ্রাম ভারতই যে প্রকৃত ভারত, সে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে।

২) এই দশক আমাদের চোখকে দেখতে শেখায়। আমরা আবিষ্কার করি সেই ভারতবর্ষকে যে ভারতে জরুরী অবস্থার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। যে ভারতে চিরকাল জরুরী অবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এই ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন, ভূমিহীন, ভূমিদাস, বঞ্চিত ক্ষেত মজুর, শোষিত ক্ষুদ্র চাষী, হত দরিদ্র জঙ্গলজীবী, কয়লা ও অন্য খনিজ খাদানে ঠিকাদারের শিকার শ্রমিক, ভারতের সকল প্রান্তে ঘৃণ্য ফুরণ দাস প্রথায় আবদ্ধ মজুর। এই দশক আমাদের উটপাখি সত্তাকে বালি থেকে ঠেলে তুলে এই লক্ষ - কোটি মানব জীবনে যন্ত্রনা দেখতে শিখিয়েছে।

৩) এই দশক আমাদের লেখক বুদ্ধিজীবীদের মনে স্থায়ী ও আলিত বিশ্বাসকে বর্জন করে নতুন করে দেশ ও মানুষ বিষয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। এই দশকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ উঠে এসেছে, যার বলে গ্রাম ভারতের ব্রাত্য লোকসমাজ আমাদের চিন্তা - মনন ও লেখায় হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক, আর এইসব মননজাত প্রক্রিয়া গেছে শোষিত মানুষের পক্ষে। নকশাল আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় নতুন ইতিহাস চেতনা জাগ্রত হয়েছে, যার ফলে আমরা বুঝেছি যে গণবৃত্তের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস এবং সে ইতিহাস আজও লেখা হয়নি।

৪) এই দশক আমাদের শিখিয়েছে যে এভাবে পূজার ফুলে বিগ্রহ চাপা দেওয়া এবং পূজা করে চলাই শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা জানাবার একমাত্র পথ নয়। নির্মোহ বিচারে দেখে যে যে জায়গায় তিনি শ্রদ্ধেয় সেগুলি নির্দেশ করে তার নবমূল্যায়ন করতে হবে। এই দশক আমাদের শেখালো যে কোনো কিছু স্থিতাবস্থা চেহারায় আর গ্রহণ করা যাবে না। চিন্তার পরাধীনতা, দাস্যতা দূর করো। নিজের চোখে দেখ, নতুন করে ভাব। চিন্তায় - মূল্যায়নে, বর্জনে ও গ্রহণে নির্মোহ এবং নির্মম হও। ভক্তির পথে মুক্তি নয়, বিজ্ঞানবাদী যুক্তির পথেই যে চেতনার মুক্তি 'এই সময়' তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

নকশালবাড়ী আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফল - পরিণামী। আর বাংলা ছোটগল্পেই সেই পরিণাম সবচেয়ে বেশি বিস্তারী ও ফলপ্রসূ। নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রবল

প্রথম অধ্যায়

প্রচন্ড অভিঘাত বাংলার সর্বস্তরের মানুষের চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। যদিও নকশালবাড়ী আন্দোলনের উপর কোন সার্বিক সমর্থন মধ্যবিত্তের চেতনায় জাগে নি, তবু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে জমি মালিক, জোতদার, মহাজনকুলের শোষণ ও অত্যাচারের চিত্রটি — মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর চেতনায় কড়া নাড়ল। গ্রামজীবনের খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত, অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষরাও আলোচনার বৃত্তে ধরা পড়ল।

নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের চেতনায় বেশ কিছু বিষয় নতুন করে ধরা পড়ল। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পার হবার পরও ভারতের আর্থ - সামাজিক অবস্থা যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি, বরং দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য যে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ধরা পড়ল জাতীয় সমীক্ষায়। গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো এবং শোষণ প্রাক্ স্বাধীনতা কালের মতোই বহাল আছে। ক্ষেত মজুর ও ভূমিদাসরা — জমি মালিক, জোতদার এবং মহাজনদের দ্বারা এখনও সমান নির্যাতীত ও শোষিত। শহুরে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন এই গ্রাম ভারত থেকে মানসিকভাবে সহস্র যোজন দূরে ছিলেন। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র - যুবরা গ্রামে গিয়ে শোষিত শ্রেণীকে রাজনীতি সচেতন করে সংগঠিত করতে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়ায় গ্রামসমাজে এক বিরাট আলোড়ন উত্থিত হল। নকশাল এ্যাকটিভিষ্টদের নেতৃত্বে গ্রামে জমি দখল, লুটপাট এবং 'খতম' অভিযান চলতে লাগল। শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা দূর হল। ক্রমে শহরেও দেখা দিল উত্তাল আন্দোলন, স্কুল - কলেজে ক্লাশ বয়কট, বিশৃঙ্খলা এবং মূর্তিভাঙ্গার রাজনীতি। ফলে —

> প্রবলভাবে আন্দোলিত হলেন সাংবাদিক ও লেখকেরা, সর্বশ্রেণীর ছাত্র ও অভিভাবকেরা এবং পুলিশ ও প্রশাসন। ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মধ্যবিত্তের কাছে যা ছিল কেবলমাত্র বই ও সংবাদপত্রে পড়া বিষয় তা হয়ে উঠল একান্ত প্রত্যক্ষ। বড় একটা ঝাঁকুনি খেল মধ্যবিত্ত সমাজ। যে সমাজ থেকে সাধারণত উঠে আসেন লেখকেরা। সেই ঝাঁকুনি থেকে কোনো স্তরের লেখকই সহজে মুক্তি পেলেন না। এই বিপন্ন সমাজ - মনস্কতা ছিল সমস্ত সত্তরের দশক জুড়ে।”

নকশালবাড়ী আন্দোলন আরো একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিকে স্পষ্টতা দিল - এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রশাসন দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে একান্তই উদাসীন। তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী আসলে রাজনৈতিক ঢক্কানিনাদ মাত্র। তাই স্বাধীনতার আড়াই দশক পরও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রের আঙিনায় আসা বামপন্থীরা যে এ বিষয়ে সমান উদাসীন নকশালপন্থীদের সৌজন্যে তা স্পষ্ট হল। ফলে বাংলা গল্পে এ সময়ের প্রতিবাদী লেখকরা রাজনৈতিক - প্রশাসনিক ভন্ডামির মুখোস খুলে দিতে তৎপর হলেন।

নকশালবাড়ী আন্দোলন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর নানা মোহভঙ্গের নির্ণায়ক - নিয়ামক হলেও তা এ যুগের নিরাশ্রয় সাধারণের মনে তিমির বিনাশী কান্তিময় কোনো আলো এনে দিতে

পারে নি। সামাজিক - রাজনৈতিক নানা অসংগতিকে আলোকিত করলেও এই আন্দোলন জনসাধারণের সার্বিক সমর্থন অর্জন করতে পারে নি। একাধিক উপদলে বিভক্ত নকশালপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ, নির্বিচার হত্যালীলা চালানো, চীনের মত ও পথকে এক ও অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা করা ইত্যাদি কারণে তারা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

"এই জটিল ও নিরাশ্রয় পরিস্থিতি বাংলা ছোটগল্পকে সবলে দাঁড় করিয়ে দিল এক প্রকৃত বাস্তবের মাঝখানে।"[২০] তবে ছোটগল্পে এই প্রভাব সুতীব্র হলেও কবিতা এবং কিছু পরিমাণে উপন্যাসেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। ষাটের দশক থেকেই উপন্যাসকে অবলম্বন করে প্রকাশনা ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য আসতে থাকে। মধ্যশিক্ষিত পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিণামে বিনোদন সর্বস্ব উপন্যাসের বাজার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

> লেখাকে জীবিকা করে তুলছেন — এমন লেখকরাও ষাটের দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের আসরে কেন্দ্রীয় জায়গায় চলে এসেছেন। উপন্যাস লেখা ও বিক্রি হওয়ার সঙ্গে জীবিকা ও বাণিজ্য জড়িত হয়ে যাবার ফলে উপন্যাসে আর পাঠক - চিত্তকে আহত - চিন্তিত - অসুখী করে তোলার ঝুঁকি নেওয়া চলে না, উপন্যাস উপপাদিত হয়ে ওঠে গণ - পাঠকের মনোরঞ্জনের দায়টি স্বীকার করে।[২১]

কিন্তু ছোটগল্প নিজেকে কখনোই গণ-পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সুলভ করে দেয় নি। তাই ছোটগল্প, প্রকাশকদের উপন্যাসের মতো বাণিজ্যিক সাফল্যও এনে দিতে পারে নি। ছোটগল্পে রয়ে গেছে লেখকের বিশ্বাসের সততা এবং আন্তরিকতা। ফলে ছোটগল্প হয়ে উঠেছে সমাজ ও সময়ের প্রকৃত অভিজ্ঞান। এই কারণে নবীন যুগের প্রতিবাদী চেতনার গল্পকাররা নিজেদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে ছোটগল্পকেই বেছে নিলেন। আর উপন্যাস প্রকাশ করবার মতো প্রকাশকও তাঁরা পেলেন না, নিজেদের প্রকাশ করবার মতো আর্থিক সক্ষমতাও তাদের ছিল না। ছোটগল্প প্রকাশ পেতে পারে ছোট ছোট অবাণিজ্যিক পত্রিকায়। সত্তর আশির দশকে এই অবাণিজ্যিক লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল —লাল নক্ষত্র, কালি ও কলম, কৃত্তন, ফসল, মধুপর্ণী, বর্তিকা, এক্ষণ, প্রতিলিপি, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রমা, অন্যদিন, মহানগর, শিলাদিত্য, অনীক, অনুষ্টুপ, কোরক, অমৃতলোক, পরিচয় ইত্যাদি। এই সব কারণে প্রাগুক্ত পত্রিকাগুলি নানা দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল।

তাই বড় পত্রিকা নয়, অজস্র লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই নতুন লেখকরা নিজেদের স্বভূমি সন্ধানে তৎপর হলেন। বড় পত্রিকা গোষ্ঠীর কাছে এদের আর কোন দায়বদ্ধতা থাকল না। প্রাতিষ্ঠানিক দায় থেকে মুক্ত হয়ে এরা নিজেদের মত পথকে আপোসহীন ধারা পথে চালিত করল। ফলে বাস্তবতার মায়া - মোহ সৃজন নয়, বাস্তবতা এখানে শরীরী হয়ে উঠল। এই সময়কার গল্পে ফিরে এলো বিবৃতিময় সারল্য, আখ্যানমনস্কতা এবং চরিত্রের প্রাণবন্ততা। গল্পকারদের অনেকের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ ছিল। শৈবাল মিত্র, অভিজিৎ সেন, কিন্নর রায়, স্বর্ণ মিত্র, শংকর বসু, তিমিরবরণ সিংহ, দ্রোণাচার্য ঘোষ প্রমুখ সত্তরের গল্পকাররা প্রত্যক্ষভাবে নকশাল আন্দোলনে

যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধী কলম ধরে শাসক-শক্তির গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে সরোজ দত্ত, দ্রোণাচার্য ঘোষ এবং তিমিরবরণ সিংহদের। ফলে অবধারিতভাবে এই পর্বের গল্পে এলো রাজনীতিমনস্কতা।

নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা এই আন্দোলনকে সমর্থনকারী গল্পকাররা কমিউনিষ্ঠ মতাদর্শের কারণে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা চিন্তায় শ্রেণীসংগ্রামের বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেন। গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব আরোপিত রূপে দেখা দিয়েছিল। অথবা সেগুলি শ্রেণীসংগ্রামের কৃত্রিম ইচ্ছাপূরণের গল্প রূপে দেখা দিচ্ছিল। অবশ্য শ্রেণীসংগ্রামের বিষয় সে সময়ের গল্পে না আসাটাই আশ্চর্যের ছিল। তবে সব গল্পেই যে নকশালবাড়ী আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়েছিল এমনও নয়। অনেক সময় এই আন্দোলনের বিরুদ্ধ কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা গেল, সত্তর দশকের সাহিত্যিক ফসল কোন না কোন ভাবে নকশাল আন্দোলনের আলোড়ন জাত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি কমবেশি চিরকালই সমাজ সচেতন। চল্লিশের দশকের ছোটগল্পে এক মতাদর্শিক সময়ক্রমের প্রতিবেদন রূপায়িত। পঞ্চাশের লেখকরা মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং তার ব্যক্তি সংকটের নানা স্তরকে সংকটকালীন সমাজ-সময়ের নিরিখে তুলে ধরলেন। কিন্তু ষাটের দশকে গল্পকাররা নিজেদের গুটিয়ে নিলেন-আপাত অবাস্তব এক আত্ম-অনুভাবনাময় বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত মধ্যবিত্তের জগৎ-এ। যেখানে অন্তর্মুখী, পরীক্ষা সর্বস্ব, ভাষা ও কারুশিল্পের প্রতি অতি মনোযোগী গল্পের ধারা সূচিত হল। ছোটগল্প থেকে 'গল্প' অনেকটাই অন্তর্হিত হল। সত্তরের দশকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রবল প্রচণ্ড অভিঘাত সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সব সনাতন ভাবনাকে ওলটপালট করে দিল। গল্পে সমাজ সংকট তথা অস্তিত্ব সংকট মধ্যবিত্ত মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। এখন মধ্যবিত্তের পাশাপাশি মনোযোগ দাবী করল বিত্তহীন, আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষেতমজুর, দিনআনা দিনখাটা এবং প্রায় উপার্জনহীন মানুষগুলিও। জনমুখী এক আবেগ ও আন্তরিকতায় লেখকরাও সাহিত্যে এদের জীবনকে বাস্তব রূপ দিতে দায়বদ্ধ হলেন। গল্পে গরীব মানুষের বাস্তব জীবন স্বীকৃত হল। এইসব গ্রামীণ হেটো-মেঠো, প্রান্তিক মানুষগুলির সহজ-সরল প্রাণবন্ত জীবনকে ধরতে গল্পে এল বিবৃতিময় সারল্য, ভাষায় এলো লোকজীবন ঘেঁষা ছাঁদ। ছোটগল্পে আবার 'গল্প' ফিরে এলো।

পশ্চিমবঙ্গের অস্থির প্রশাসনিক হাত বদল, মুক্তিযুদ্ধের ফলে এপার বাংলায় উদ্বাস্তুর ঢল এবং তাদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা, মানুষের নৈঃসঙ্গ, হতাশা, অনিশ্চয়তা ও নিরাশ্রয়তা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলল। এই বিপন্ন সমাজমনস্কতা সত্তরের দশকের ছোটগল্পকারদের সৃষ্টি প্রেরণার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিল। ফলে বাংলা ছোটগল্পে এলো প্রকৃত বাস্তবের প্রতিভাস—'ডিসটার্বিং' জীবন সমালোচনা। বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে দেখা গেল—বিষয় বিন্যাস, রচনারীতি ও জীবনদৃষ্টিতে গ্রামজীবনের ছবি ও বাস্তবতার নিখাঁদ রূপ তুলে ধরার এক নবতর বীক্ষা; সমাজের ব্রাত্যজনদের জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা এবং নিম্নবর্গের প্রান্তিক সমাজের প্রতিবেদনকে রূপ দেবার

প্রয়াস। ফলে এই সময় গ্রামকেন্দ্রিক লেখালেখির সূচনা হল, লেখালেখিতে কোলকাতা কেন্দ্রিকতা দূর হল। গ্রাম বাংলা এবং মফস্বল শহর পটভূমি হিসেবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হল।

গ্রাম থেকে শহরে আসা শুরু হয়েছিল ষাটের দশক থেকে। কিন্তু এই সময় শহর থেকে গ্রামে গেছেন একদল তরুণ। গ্রাম ও মফস্বলের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয়েছে এই তরুণদের। তাদের বিপ্লবী প্ররোচনায় শহরের মানুষ গ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও কার্যোপলক্ষে শহর থেকে সরকারী কাজ নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন - বি. ডি. ও - কানুনগো - জে. এল. আর ও - শিক্ষক - গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারী, কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা। এঁরা এঁদের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে কেউ কেউ গল্প লিখলেন।

> আউটিং বা স্টাডিট্যুরের জন্য গ্রামদর্শন নয়। গ্রাম আর গ্রামের মানুষের সঙ্গে অভিজ্ঞতার যোগ, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা অনেক গল্প। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের অনেকের কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদী মনোভঙ্গী থেকে গল্প লেখার ফলে তার মধ্যে পরোক্ষভাবে হলেও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে। হয়তো একে রাজনৈতিক [illegible] এঁদের সমাজজিজ্ঞাসাও ধরা যেতে পারে।[illegible]

নকশালবাড়ী আন্দোলন ছাড়াও আরো কিছু কারণে সত্তর - আশির দশকে গ্রামকেন্দ্রিক লেখালেখির সূচনা হয় এবং ব্রাত্যজনের রুদ্ধকণ্ঠ ক্রমে স্পষ্টতর হতে থাকে।

১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন চালু হবার পর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই ব্যবস্থায় দশ-পনেরোটি গ্রাম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ গড়ে ওঠে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে গ্রামের মানুষের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার অনেকটাই সুরক্ষিত হল। পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরেই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ফলে গ্রামের মানুষ অধিকার সচেতন ও রাজনীতিমনস্ক হয়ে উঠল এবং জায়মান সামাজিক রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে এই গ্রামসমাজ সত্তর দশকের ছোটগল্পের প্রেরণাভূমিতে পরিণত হল।

আশির দশকে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে প্রচুর বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষক জমি লাভ করে। কিন্তু সকলের বর্গা স্বত্ব রেকর্ড হল না, জমি পেয়েও জোতদারের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে জমি রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভাগ চাষীকে মালিকানা দেওয়া সম্ভব হল না এবং খাস জমি বন্টনে প্রভূত দুর্নীতি ও স্বজন পোষন চলল। পঞ্চায়েতগুলির কর্তৃত্ব থাকল জোতদার, মালিক চাষী, শিক্ষক ও মধ্যবিত্তের হাতে। ফলে ভূমিহীন চাষী বা ক্ষেত মজুরদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটল না। এই ভূমিকেন্দ্রিক বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের ছাপ পড়ল বাংলা ছোটগল্পে। জমিকে কেন্দ্র করে গ্রামে গঞ্জে শ্রেণী বিরোধের রূপটি চরমভাবে প্রকটিত হল। অপারেশন বর্গার সমস্যা ও সংকট নিয়ে রচিত হতে থাকল নানা গল্প। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, ট্রাক্টর দিয়ে চাষ, ডিপ্ টিউবয়েল দ্বারা জলের যোগান সুলভ করা — ইত্যাদির পাশাপাশি উন্নত

LIBRARY
272104

বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' নিয়ে আসে। জমির গুরুত্ব ও মূল্য অভাবিতভাবে বেড়ে যায়। শাসক দলের রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে জোতদার, জমিদার, জমি মালিকদের এজেন্ট রূপে কাজ করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়, কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পথভ্রষ্টতা রূপ পেতে থাকে। এই সময়কার গল্পকারদের চেতনায় রূপ পেয়েছে এইসব জীবন ঘনিষ্ঠতার বহুমাত্রিক ছবি এবং জমি সম্পৃক্ত মানুষদের কথা।

এই কালপর্বে মুসলমান সমাজের কথা বাংলা ছোটগল্পে একটা ব্যাপক অংশ দখল করল। মুসলমান পাত্র-পাত্রী, তাদের সমাজ সমস্যা, রীতি-নীতি, দারিদ্র্য প্রভৃতি সত্যমূল্য নিয়ে গল্পে রূপ পেল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার, আফসার আমেদ প্রমুখদের হাত ধরে বাংলা গল্পে এতদিনের প্রায় অনালোকিত, ছায়াচ্ছন্ন একটি দিক স্বাভাবিকতায় জীবন্ত হয়ে উঠল। গ্রামজীবনের সঙ্গে এই সময়কার লেখকদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রে, আবার কখনো বা সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ ভাষ্য রচনার জন্যও মুসলমান সমাজ ও পাত্র-পাত্রীরা গল্পে স্থান পেতে লাগল।

সত্তর-আশির দশকের বাংলা গল্পে পালাবদল শুরু হল মহাশ্বেতা দেবীর হাত ধরে। বাংলা সাহিত্যে সত্তর-আশির দশকের সমাজ-ইতিহাসের অতন্দ্র প্রহরী মহাশ্বেতা দেবী নকশালবাড়ী আন্দোলন তথা সত্তর-আশির দশকের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সারাৎসার রূপ পেয়েছে মহাশ্বেতার গল্প বিশ্বে। নিজের লেখা বিষয়ে মহাশ্বেতা স্বয়ং বলেছেন —

> সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্যবিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখকেরই মূল্যায়ন করা যায় না,...।"

নকশালবাড়ী আন্দোলন দমনে পুলিশি অত্যাচার, সর্বহারা মানুষদের সীমাহীন দুর্দশা, নিরন্ন মানুষদের ধীরে ধীরে সচেতন হবার প্রক্রিয়া এবং তাদের সংঘবদ্ধতাকে মহাশ্বেতা তাঁর গল্পে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। "নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন সত্তর দশককে যদি কোনও অস্ত্রের মতো সুতীক্ষ্ণ মসি দিয়ে থাকে, তবে তা মহাশ্বেতার করতলগত।"[২৬] সমাজের আদিবাসী, অন্তেবাসী মানুষ, তাদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, শোষণ-যন্ত্রনার চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মতায় স্তরে স্তরে তিনি খুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবী নিজে বলেছেন —"আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি Voiceless Section of Indian Society এই অংশ এখনো শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূলস্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না।"[২৫]

এইসব নিম্নবর্গের অন্ত্যজ উপজাতিক মানুষগুলি সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, সংস্কার তথা ইতিহাসের শাসনে নির্বাসিত। জীবন তথ্যের প্রয়োজনে মহাশ্বেতা এদের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং এদের জীবন জীবিকা ও সংস্কার মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। যে ব্যবস্থা এইসব হত দরিদ্র প্রান্তিক মানুষগুলিকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিল না, গল্পে সেই ব্যবস্থার প্রতি বিঘোষিত হয়েছে মহাশ্বেতার সূর্যসম ক্রোধ। এই প্রতিবাদেরই আগুন বর্ষিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলিতে।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী গল্পের ধারা সূচিত হয়েছে মহাশ্বেতার হাত ধরে।

তাঁর 'জল', 'অপারেশন বাসাই টুডু', 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'আজীর', 'মাদার ইন্ডিয়া' প্রভৃতি গল্পগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যের এক নতুন পথকেই নির্মাণ করে নি, গল্পগুলি হয়ে উঠেছে নতুন ধারার গল্পকারদের প্রেরণাস্থল। তাই সত্তরের দশকের বেশ কিছু গল্পকার মহাশ্বেতা-র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পথ চলতে শুরু করেছেন। আবার অনেককে তিনি নিজের প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির সূত্রে কোলকাতার বিশিষ্ট অবাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। বাংলা গল্পের এই পালাবদল পর্বে মহাশ্বেতার সহযাত্রী ছিলেন অসীম রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দেবেশ রায় ও অমলেন্দু চক্রবর্তী।

মহাশ্বেতা ছাড়া সত্তর - আশির দশকের অন্যান্য প্রতিস্রোতপন্থী গল্পকাররা হলেন - ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০), আবুল বাশার (১৯৫১), অমর মিত্র (১৯৫১), আফসার আমেদ (১৯৫৯), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭), জয়ন্ত জোয়ারদার (১৯৪৬), [illegible] মণ্ডল (১৯৫০), নলিনী বেরা (১৯৫১), [illegible] (১৯৫১), কিন্নর রায় (১৯৫৩), প্রলয় সুর (১৯৪৫) এবং অভিজিৎ সেন (১৯৪৫?)।

জীবনের প্রতি এক অকৃত্রিম দায়বদ্ধতায় এই লেখকরা সংকটগ্রস্ত বিপন্ন অস্তিত্বের অন্ত্যজ মানুষগুলির পক্ষে কলম ধরেছেন। এরা কখনো পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থার আড়ালে থাকা জোতদার, রাজনৈতিক নেতা বা শাসনযন্ত্রের অংশীদারদের মুখোস টেনে খুলে দেন, কখনো বা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সরকারী আমলা ও পুলিশ প্রশাসনের স্বার্থপরতার নগ্নতাকে অনাবৃত করেন, আবার কখনো প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির শীকার হওয়া হত দরিদ্র মানুষের দুরবস্থাকে গল্পের কথাবস্তুতে রূপ দেন। এই সব হত দরিদ্র মানুষগুলির বিপন্নতার প্রতিবেদনকে তুলে ধরতে এঁরা নান্দনিক কোন আড়াল অবডাল খোঁজেন নি, এক প্রবল প্রাকৃতায়নের প্রবণতায় এদের গল্পের ভাব-ভাষা ও ভঙ্গি হয়ে উঠল স্বাভাবিক, সঙ্গত ও জীবন্ত।

এই সময়ের একজন শক্তিশালী গল্পকার অভিজিৎ সেন। তবে শক্তিমত্তা সত্ত্বেও গল্পকার অভিজিৎ সেন প্রচারের দৈন্যে সাধারণ পাঠকদের থেকে এখনও যেমন খানিকটা দূরে, তেমনি তাঁর ছোটগল্পের সামগ্রিক গভীর শিল্পবিচার এখনও অপেক্ষিত। পূর্ববাংলা, উত্তরবঙ্গ এবং কোলকাতা এই বিস্তৃত ভূগোল নিয়ে তাঁর গল্প বিশ্ব গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার কিছু অংশের জল ও মাটির গন্ধ লেগে আছে তাঁর গল্পে। আছে নদী, গঞ্জ, হাট, আছে সাইকেল রিক্সা অধ্যুষিত রাস্তা, কদাচিৎ টাঙ্গা। বাংলাদেশ সীমান্ত খুব দূরে নয়। নানান বৃত্তির মানুষ —হেটো, মেঠো মানুষেরা আগাগোড়াই গ্রামীণ, অনেকেই প্রান্তিক, কেউ কেউ অন্ত্যজও, আছে আদিবাসী সমাজের কথা — তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার। মুসলমান সমাজের বহুস্তরীয় ছবি, নকশাল আন্দোলনের গল্প, অপারেশন বর্গার বহুস্তরীয় সংকট ঘনীভূত হয়েছে তাঁর গল্প প্রতিবেদনে। শুধু গল্প বস্তুতে নয়, আঙ্গিক পরিকল্পনাতেও অভিজিৎ একান্ত ভাবেই একজন সত্তর - আশির দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকার। সব মিলিয়ে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প যথার্থ অর্থেই সত্তর - আশির দশকের সমাজ ও সময়ের অভিজ্ঞান।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী ঃ

১। কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৫৩।

২। বাংলা ছোটগল্পঃ উৎস ও স্বরূপ, মনোজ মুখোপাধ্যায়, বামা পুস্তকালয়, ২০০৫ - ০৬, পৃঃ ৬৭

৩। মায়াবী নিষাদ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬ সন/১৯৬৯খ্রীঃ।

৪। কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃঃ ৪০৮।

৫। সত্তর দশকের রাজনীতি, গৌতম সেন, সত্তর দশক - ১ম খণ্ড, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, (পৃঃ ১১৩ - ১৪)।

৬। তথ্য গৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ থেকে —

ক) 'শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী' রাজনৈতিক পটভূমি অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, বর্ষবরণ সংখ্যা ১৪০১সন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (প্রধান সম্পাদক তারাপদ রায় সম্পাদক - দিব্যজ্যোতি মজুমদার)।

খ) বাংলার রাজনীতি ঃ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া - সুশান্ত ঘোষ, দীপ প্রকাশন, ২০০৬।

গ) জগতী ইয়ার বুক ২০০৯, সৌমেন মজুমদার, জগতী পাবলিশার্স, ২০০৯।

৭। ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, শৈবাল মিত্র, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, সম্পা অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, মার্চ ২০০৮, পৃঃ৬৯

৮। তদেব, পৃঃ ৬৯ - ৭০।

৯। নকশালবাড়ী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, নির্মল ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৪০১ সন, পৃঃ ৬০

১০। ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, শৈবাল মিত্র, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, সম্পা অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃঃ ৭২।

১১। ভারতে নকশাল আন্দোলন, প্রকাশ সিং, যোজনা, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২০০৮, পৃঃ ৯।

১২। ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, শৈবাল মিত্র, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃঃ (৭৩ - ৭৪)।

১৩। কবিতা ঃ সত্তর দশক, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোরক, শারদ, ১৯৯৬।

১৪। সত্তর দশকের রাজনীতি, গৌতম সেন, সত্তর দশক - ১ম খণ্ড, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০১০, পৃঃ (১২৬ - ২৭)

১৫। ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, শৈবাল মিত্র, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃঃ ৮৩।

১৬। তদেব, পৃঃ ৮৩।

১৭। সত্তর দশক - ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ, সম্পা, অনিল আচার্য, ২০১০, পৃঃ xviii।

১৮। সত্তরের দশক ও তারপরে, মহাশ্বেতা দেবী, সত্তর দশক - ১ম খণ্ড, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০১০, পৃঃ (৫৫ - ৫৭)

১৯। ছোটগল্পের বিষয় - আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণী, ২০০৪, পৃঃ ৭৮।

২০। তদেব, পৃঃ ৭৮।

২১। তদেব, পৃঃ ৭৯।

২২। বাংলা ছোটগল্প ঃ সাতের দশক ও তারপর, অলোক রায়, প্রসঙ্গ ঃ ছোটগল্প, সম্পা, মানবেন্দ্রনাথ দত্ত ও শুভেন্দু মিশ্র, পাণ্ডুলিপি, ২০০৬, পৃঃ(৭-৮)।

২৩। শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকাংশ মহাশ্বেতা দেবী, প্রমা, ১৯৮৪।

২৪। সত্তর দশকের ছোটগল্প, অনিল আচার্য, সত্তর দশক - ২য় খণ্ড, সম্পা, অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২০১০, পৃঃ ৩০০।

২৫। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প, ভূমিকা, মহাশ্বেতা দেবী, প্রতিক্ষণ, [illegible]